

“নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র: ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার” এর ইতিহাস

UNIVERSITY OF KALYANI

COLLEGE NAME :

KALYANI MAHAVIDYALAYA

Name..... (Roll number No8/His1/.....) .

Name -

Subject - History

Enrolment number -

No8/MA/.....



1. ভূমিকা (Introduction)

- 1.1. কৃষ্ণনগর রাজা গবেষণার উদ্দেশ্য Page no 1
- 1.2. গবেষণার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা Page no 3,4
- 1.3. কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক পটভূমি Page no 5
- 1.4. কৃষ্ণনগর রাজাদের (বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র) ইতিহাসে ভূমিকা page no 10

2. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background)

- 2.1. নদীয়া জেলার ইতিহাস Page no 12
- 2.2. কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের উত্থান Page no 15
- 2.3. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (মুঘল, নবাবি, ইংরেজ শাসনকাল) Page no 17
- 2.4. কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ Page no 20

3. কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (Raja Krishnachandra) –

- 3.1. ব্যক্তিগত জীবন ও শাসনকাল Page no 23
- 3.2. মুর্শিদকুলি খাঁ, সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সম্পর্ক Page no 26
- 3.3. প্লাসি যুদ্ধের আগে ও পরে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা Page no 28
- 3.4. কৃষ্ণচন্দ্র ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি Page no 31
- 3.5. সমকালীন সমাজে প্রভাব Page no 34

4. কৃষ্ণনগর রাজা ও সমাজসংস্কৃতি (Social & Cultural Contributions)

- 4.1. সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যচর্চা Page no 37
- 4.2. কীর্তন, ব্রজবুলি, পদাবলি কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকতা Page no 39
- 4.3. মৃৎশিল্প (Krishnanagar clay dolls) Page no 41
- 4.4. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার Page no 44

5. সমালোচনা ও বিতর্কিত দিক (Criticism & Controversies)

- 5.1. প্লাসির ষড়যন্ত্রে ভূমিকা Page no 47
- 5.2. ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত নিয়ে সমালোচনা Page no 48
- 5.3. জমিদারি শোষণ ও প্রজাদের অবস্থা Page no 50

6. মন্দির স্থাপন (Temple construction)

- 6.1. শিব নিবাস ও স্থাপত্যচর্চায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজার ভূমিকা – Page no 52

7. উপসংহার (Conclusion)

- 7.1. কৃষ্ণনগর রাজাদের উত্তরাধিকার Page no 54
- 7.2. বর্তমান কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তাদের অবদান Page no 56
- 7.3. গবেষণার সারসংক্ষেপ Page no 57

8. তথ্যসূত্র (Bibliography / References)

- 8.1. প্রাথমিক সূত্র (চিঠিপত্র, দলিল, ভ্রমণকাহিনি) Page no 59
- 8.2. গৌণ সূত্র (বই, প্রবন্ধ, জার্নাল) Page no 60

কৃতজ্ঞতা স্বীকার Page no 63

ভূমিকা:-

1.1. গবেষণার উদ্দেশ্য:

কৃষ্ণনগরের নামকরণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামানুসারে হয়েছে। কৃষ্ণনগর রাজা গবেষণা বলতে মূলত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল, তাঁর রাজ্য পরিচালনা, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই অঞ্চলে তাঁর যে অবদান রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করা বোঝায়। তাঁর শাসনামলে কৃষ্ণনগর একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে।



রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

1. গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

i. ঐতিহাসিক অনুসন্ধান – কৃষ্ণনগরের প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস অন্বেষণ করা।

ii. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনৈতিক অবদান –

মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা, বিশেষ করে ব্রিটিশদের উত্থানের সময় তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এবং তাঁর রাজ্য নদিয়ার শাসনে তাঁর অবদান নিয়ে গবেষণা করা।

iii. সংস্কৃতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা –

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্পকলার সম্প্রসারণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যিকদের অবদান (যেমন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর) নিয়ে গবেষণা করা।

iv. কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক বিকাশ:

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কৃষ্ণনগর কীভাবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, সেখানকার শিল্প, সাহিত্য নাটক, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও মৃৎশিল্পসহ ও ধর্মীয় দিকগুলোর বিকাশ কীভাবে হয়েছিল, তা নিয়ে গবেষণা করা।

v. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনামলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সাধারণ মানুষের জীবন এবং সমাজ-অর্থনীতিতে রাজার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করা।

vi. রাজবাড়ি ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্মিত রাজবাড়ি এবং তাঁর সময়ের অন্যান্য স্থাপত্যের নির্মাণশৈলী ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা করা।

vii. ঔপনিবেশিক প্রভাব বিশ্লেষণ -

ইংরেজ শাসনামলে কৃষ্ণনগরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন চিহ্নিত করা।

Viii. সমকালীন তাৎপর্য নির্ধারণ -

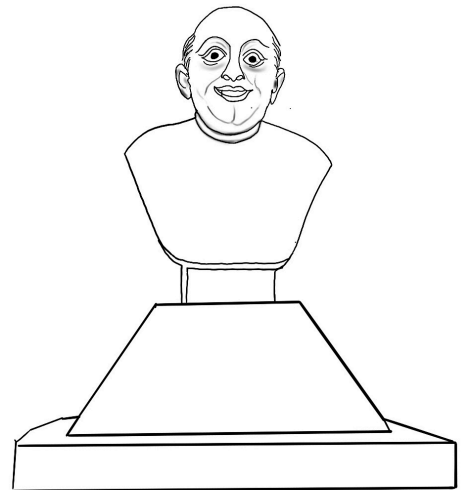
আধুনিক যুগে কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরা।

ix. গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তার -

কৃষ্ণনগরের ইতিহাস নিয়ে নতুন তথ্য সংগ্রহ ও ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা।

vi. গোপাল ভাঁড়-এর মিথ -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র গোপাল ভাঁড় এবং তাঁর লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজা ও তাঁর রাজসভার সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করা।



গোপাল ভাঁড়

1.2. গবেষণার গুরুত্ব :-

i. ঐতিহাসিক গুরুত্ব -

কৃষ্ণনগরের ইতিহাস কেবল একটি অঞ্চলের ইতিহাস নয়, এটি সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ii. সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার -

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, মাটির পুতুল, নাট্যচর্চা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব।

iii. শিক্ষাগত অবদান -

এ গবেষণা ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে।

iv. পর্যটন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ -

কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও শিল্পকলা পর্যটনের আকর্ষণ বাড়াতে পারে; গবেষণা এই দিকটিকেও গুরুত্ব দিতে সাহায্য করবে।

v. আঞ্চলিক পরিচয়ের বিকাশ -

কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনরায় মূল্যায়ন করলে আঞ্চলিক ইতিহাস আরও দৃঢ়ভাবে জাতীয় পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

vi. ভবিষ্যৎ গবেষণার পথপ্রদর্শক - এ গবেষণা কৃষ্ণনগরের অজানা ও অল্প আলোচিত দিকগুলো নিয়ে নতুন গবেষণার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

1.2. গবেষণার সীমাবদ্ধতা :-

তবে এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান—

১. তথ্যের স্বল্পতা -

কৃষ্ণনগর রাজাদের সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের সংখ্যা সীমিত এবং অনেক তথ্য মৌখিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল।

২. ঐতিহাসিক পক্ষপাত -

ইংরেজ শাসক বা সমকালীন লেখকদের বিবরণ অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট, ফলে সত্যতা যাচাই কঠিন হয়।

৩. আঞ্চলিক ফোকাস -

গবেষণা মূলত কৃষ্ণনগরকেন্দ্রিক হওয়ায় সমগ্র বাংলার বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি ধরা পড়ে না।

৪. উৎসের অভাব -

দলিল-দস্তাবেজ, আর্কাইভ বা রাজবংশীয় নথি অনেকটাই নষ্ট বা অপ্রাপ্য হয়ে গেছে।

৫. ব্যাখ্যার জটিলতা -

সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে নানা মতবিরোধ দেখা দেয়।

1.3. কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক পটভূমি :-

কৃষ্ণনগর শহরটি পূর্বে 'রেউই' নামে পরিচিত ছিল এবং এটি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭২৮-১৭৮২) নামে নামকরণ করা হয়। তাঁর রাজত্বকালে কৃষ্ণনগর ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল এবং তিনি পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করেন। শহরটি বিখ্যাত মাটির পুতুল ও জগদ্ধাত্রী পূজার জন্যও পরিচিত, যা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই শুরু হয়েছিল।

১. নামকরণ ও পূর্বের নাম:-

কৃষ্ণনগরের প্রাচীন নাম ছিল 'রেউই'।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভবানন্দ মজুমদার নদীয়ার রাজপরিবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে মহারাজা রুদ্র কৃষ্ণনগর নাম পরিবর্তন করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭২৮-১৭৮২) এই শহরের নামকরণ করেন এবং তাঁর নামে এর নামকরণ করা হয়।

২. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা :-

কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার একজন সংস্কৃতিমনা ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন, যিনি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

তাঁর সময়ে (১৭২৮-১৭৮২) নদীয়ার কালেক্টরেট জেলা গঠিত হয়েছিল এবং তিনি পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সমর্থন করেছিলেন।

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথা শুরু করার জন্য তিনি বিখ্যাত, যার জন্য কৃষ্ণনগর পরিচিত।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রায় একশো আটটি মন্দির স্থাপন এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ (শিবনিবাস) ধারণ করার মধ্যে নিহিত।

৩. সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব:-

কৃষ্ণনগর ছিল বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর, যা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

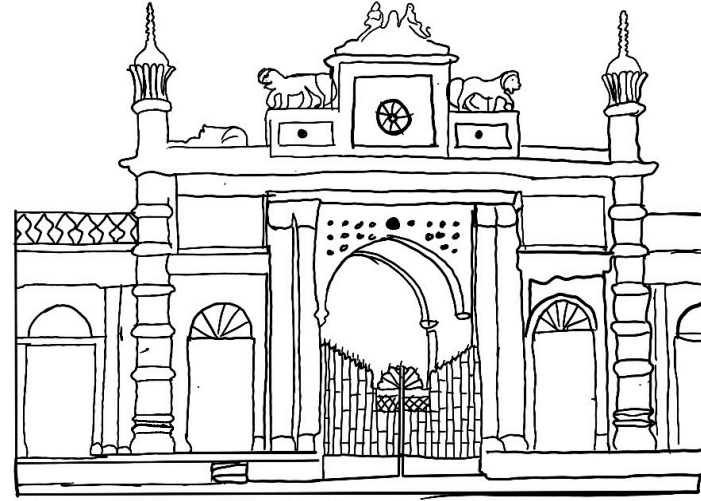
শহরের পাশেই অবস্থিত 'ঘুর্নি' নামক গ্রাম বিশ্ববিখ্যাত মাটির মডেল ও পুতুল শিল্পের উৎপত্তিস্থল।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের প্রতীক এবং পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

1.3. কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক পটভূমি:-

কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলার সদর শহর ও পৌরসভা, মূলত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭২৮-১৭৮২) নামে পরিচিত এবং তাঁর রাজত্বকালে তিনি এই শহরটির নামকরণ করেন। এর পূর্বে শহরটি 'রেউই' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক এই শহরটি তার পোড়ামাটির মন্দির, মাটির পুতুল, সরপুরিয়া ও সরভাজার মতো মিষ্টি এবং বারোদোলের মেলা-এর জন্য বিখ্যাত।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্য করেন এবং নদীয়া কালেক্টরেট জেলা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।



কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি

১. নামকরণ ও প্রাথমিক ইতিহাস:

নামকরণ –

শহরটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭২৮-১৭৮২) নামে নামকরণ করা হয়।

পূর্বনাম -

কৃষ্ণনগরের প্রাচীন নাম ছিল 'রেউই', যা মূলত গোপ বা গোয়ালাদের জনপদ ছিল।

ভিত্তি -

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবানন্দ মজুমদার নদীয়ার রাজপরিবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র রাঘব রায় রেউই গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন।

২. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কাল:-

রাজনৈতিক ভূমিকা -

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশাসনিক গুরুত্ব -

তাঁর রাজত্বকালে নদিয়া কালেক্টরেট জেলা গঠন করা হয় এবং দেওয়ানি আদালত স্থাপন করা হয়।

ঐতিহ্য রক্ষা -

তিনি বারোদালের মেলার প্রবর্তন করেন, যা বাংলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মেলা।

৩. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য:-

পোড়ামাটির শিল্প -

কৃষ্ণনগর তার জগৎবিখ্যাত মাটির পুতুল ও মডেলের জন্য বিখ্যাত, যা প্রধানত ঘূর্ণী অঞ্চলে তৈরি হয়।

মিষ্টি -

সরপুরিয়া ও সরভাজার মতো বিখ্যাত মিষ্টির স্বাদও এখানে পাওয়া যায়।

মন্দির ও রাজবাড়ি:

শহরটিতে রয়েছে অসংখ্য চমৎকার পোড়ামাটির মন্দির এবং একটি জীর্ণ কিন্তু ঐতিহাসিক রাজবাড়ি, যা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

৪. সময়কাল:-

প্রাচীনকাল -

কৃষ্ণনগরের আশেপাশের অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গা নদীর তীরবর্তী বসতি হিসেবে গড়ে ওঠে। নদীয়া ছিল প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চল।

নদীয়ার নবদ্বীপ ছিল সেন যুগে বাংলার রাজধানী। লক্ষ্মণ সেনের সময় (১২শ শতাব্দী) এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

মধ্যযুগ -

১৫শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের চারপাশ ভক্তি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মচর্চা, কীর্তন, পদাবলী সাহিত্য ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

নবাবি যুগ ও রাজপরিবার -

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করার পর নদীয়া ও কৃষ্ণনগর ধীরে ধীরে আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৭শ শতাব্দীতে নদীয়া রাজপরিবারের উত্থান ঘটে। কৃষ্ণনগর রাজারা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭২৮-১৭৮৩) ছিলেন কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু রাজনীতি নয়, বাংলা সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও কলার মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ঔপনিবেশিক যুগ -

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর ইংরেজ শাসনের অধীনে কৃষ্ণনগরের রাজারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বজায় রাখেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প (বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুল) এই সময় বিশেষ খ্যাতি পায়।

উনিশ শতকে কৃষ্ণনগর শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে বেশ কিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিককাল -

কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও শিল্পকলার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আজও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি, গির্জা, ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শনগুলি তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে।

1.3. কৃষ্ণনগর রাজাদের (বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র) ইতিহাসে ভূমিকা :-

কৃষ্ণনগর রাজাদের মধ্যে বিশেষভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩ খ্রিঃ) ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি ছিলেন নদীয়া রাজবংশের সর্বাধিক প্রভাবশালী শাসক এবং বাংলার ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিচে তাঁর ভূমিকা কয়েকটি দিক থেকে তুলে ধরা হলো—

১. রাজনৈতিক ভূমিকা -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নদীয়া রাজবংশের অন্যতম শক্তিশালী শাসক।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দি খাঁ-এর আমলে তিনি বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখলেও নবাবদের বিরুদ্ধেও কৌশলগত অবস্থান নিয়েছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধে তাঁর অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে—অনেকে বলেন তিনি গোপনে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন, আবার অনেকে মনে করেন তিনি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

২. সাংস্কৃতিক ভূমিকা -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন এক মহান শিল্পসংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।

কৃষ্ণনগরকে তিনি বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিল্পকলার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন।

বাংলার কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁর দরবারে আশ্রয় পান। যেমন—কবি ভরতচন্দ্র রায় গানগোপাধ্যায় (অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা)।

নাটক, কীর্তন, কীর্তনিয়া দল, এবং লোকশিল্পের বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

৩. ধর্মীয় ভূমিকা –

তিনি ছিলেন গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক।

অসংখ্য মন্দির, দেবালয় ও ধর্মীয় উৎসবের প্রচলন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল।

দুর্গাপূজা ও রাসযাত্রার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন তাঁর আমলেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

৪. প্রশাসনিক ও সামাজিক ভূমিকা –

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। প্রজাদের কল্যাণে তিনি বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে তিনি দানশীলতা ও সহায়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নদীয়া অঞ্চলে শিক্ষা ও বিদ্যার প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫. কৃষ্ণনগরের বিশেষ পরিচিতি –

কৃষ্ণনগর আজও “শিল্প ও সংস্কৃতির নগরী” হিসেবে খ্যাত। এর পিছনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান সর্বাধিক।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, মন্দির স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি—সবই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়।

2. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background) –

2.1. নদীয়া জেলার ইতিহাস :-

নদীয়া জেলার ইতিহাস বাংলার সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত। নিচে ধারাবাহিকভাবে নদীয়ার ইতিহাস তুলে ধরা হলো:

১. প্রাচীন যুগ –

নদীয়া জেলার প্রাচীন নাম ছিল নবদ্বীপ মণ্ডল।

গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলির দ্বারা বেষ্টিত এ অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই উর্বর ভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল।

গুপ্ত যুগ থেকে নদীয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

২. মধ্যযুগ –

সেন যুগে নদীয়া ছিল বাংলার রাজধানী। লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৬ খ্রিঃ) নদীয়াকে তার রাজধানী করেছিলেন।

১২০৪ খ্রিঃ বখতিয়ার খলজি আক্রমণ চালিয়ে নদীয়া দখল করেন, যা বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটায়।

নদীয়া তখন থেকেই মুসলিম শাসনের অধীনে চলে যায়, তবে হিন্দু ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেও এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

৩. দেশভাগ ও পরবর্তী কাল –

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কৃষ্ণনগর জেলা সদর হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

নদীয়া পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় দেশভাগের সময় বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এখানে আশ্রয় নেয়।

বর্তমানে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও কৃষিনির্ভর অঞ্চল।

৪. নবাবি আমল -

১৭শ-১৮শ শতকে নদীয়ার জমিদার ও রাজবংশ নবাবদের শাসনকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কৃষ্ণনগর নগরী গড়ে ওঠে নদীয়ার রাজধানী ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে।

এই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্র রক্ষা করেন।

৫. পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরেজ শাসন -

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ নদীয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

নদীয়ার রাজারা ব্রিটিশদের সহযোগী হয়ে ওঠেন। এর ফলে ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে।

পরবর্তীতে কৃষ্ণনগর শহর ইংরেজ আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

৬. ঔপনিবেশিক যুগে নদীয়া -

১৯শ শতকে নদীয়া জেলা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবজাগরণে।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে।

সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় নদীয়ার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজরা প্রশাসনিক সুবিধার্থে নদীয়া জেলা গঠন করে এবং কৃষ্ণনগরকে সদর শহর করে তোলে।

৭. স্বাধীনতা আন্দোলনে নদীয়া -

নদীয়ার মানুষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. দেশভাগ ও পরবর্তী কাল –

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কৃষ্ণনগর জেলা সদর হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

নদীয়া পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় দেশভাগের সময় বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এখানে আশ্রয় নেয়।

বর্তমানে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও কৃষিনির্ভর অঞ্চল।

৯. নবদ্বীপ ও বৈষ্ণব আন্দোলন –

১৫শ শতকে নদীয়া নতুন করে আলোচনায় আসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬–১৫৩৩) আবির্ভাবের মাধ্যমে।

নবদ্বীপ হয়ে ওঠে বৈষ্ণব ধর্মমতের কেন্দ্র। ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে।

এর ফলে নদীয়া শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সংক্ষেপে, নদীয়া জেলার ইতিহাস প্রাচীন রাজধানী নদীয়া থেকে শুরু করে বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্র, পলাশীর যুদ্ধের সাক্ষী, ঔপনিবেশিক যুগের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অংশ—এমনই এক বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক।

2.2. কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের উত্থান :-

কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের ইতিহাস নদীয়া জেলার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাংলার জমিদারি প্রথা, নবাবি আমল এবং পরে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে এ পরিবারের উত্থান সম্পর্কিত।

১. প্রাথমিক সূচনা -

কৃষ্ণনগর রাজবংশের উৎপত্তি ঘটে নদীয়ার রাজবংশ থেকে। ১৫শ শতকের দিকে নবদ্বীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলে জমিদারির ভিত্তি গড়ে ওঠে। নদীয়ার প্রাচীন শাসকরা মূলত সেন যুগের অভিজাত পরিবারের উত্তরসূরি বলে ধারণা করা হয়।

২. রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা -

রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সাধারণত রুদ্র রায় বা রুদ্র রায়ের উত্তরসূরি রাঘব রায়কে উল্লেখ করা হয়।

তঁারা নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং জমিদারির বিস্তার ঘটান।

নদীয়ার নবাবি দরবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তঁারা কৃষ্ণনগরে ক্ষমতা সংহত করেন।

৩. মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে উত্থান -

১৮শ শতকের গোড়ায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রশাসনিক সংস্কার চালান। এ সময় কৃষ্ণনগরের জমিদাররা নবাবের অনুগত থেকে নিজেদের জমিদারি ও ক্ষমতা বাড়ান। এভাবে কৃষ্ণনগর রাজপরিবার ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

৪. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উত্থান -

রাজপরিবারের সর্বাধিক খ্যাতিমান শাসক হলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩)।

তাঁর সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। তিনি প্রথমে নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনুগত হলেও পরবর্তীতে ইংরেজদের সহযোগিতা করেন।

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও তার পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হন, যার ফলে তাঁর জমিদারি ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

৫. সাংস্কৃতিক অবদান –

কৃষ্ণনগর রাজপরিবার শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সাহিত্য, নাটক, সংগীত ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শিল্পের বিকাশে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬. ইংরেজ শাসনে টিকে থাকা –

পলাশীর যুদ্ধের পর অধিকাংশ জমিদারই ক্ষমতা হারালেও কৃষ্ণনগর রাজপরিবার ইংরেজদের অনুগত থেকে তাদের জমিদারি ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

এভাবেই ব্রিটিশ আমলে কৃষ্ণনগর রাজবংশ এক গুরুত্বপূর্ণ জমিদার পরিবারে পরিণত হয়।

সংক্ষেপে, কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের উত্থান ঘটেছিল নদীয়ার জমিদার প্রথা থেকে, যা নবাবি আমলে শক্তিশালী হয় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কারণে এ পরিবার দীর্ঘদিন তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

2.3. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (মুঘল, নবাবি ও ইংরেজ শাসনকাল) :-

কৃষ্ণনগর ও
নদীয়া জেলার ইতিহাস
বোঝার জন্য সমকালীন
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
বিশ্লেষণ করা জরুরি।
মুঘল শাসনকাল থেকে
শুরু করে নবাবি আমল
ও ইংরেজ শাসনের
প্রথম পর্ব পর্যন্ত
রাজনীতি কৃষ্ণনগরের
রাজপরিবারের উত্থান
ও বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।



১. মুঘল শাসনকাল -

১৬শ শতকে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। সম্রাট আকবরের সময় বাংলাকে সুবা (Subah) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রশাসনিক সংস্কার চালু হয়। নদীয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল। জমিদাররা মুঘল দরবারের অধীনস্থ হয়ে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পালন করত। কৃষ্ণনগরের প্রাথমিক জমিদাররাও মুঘল শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের জমিদারি সংরক্ষণ করেন।

মুঘল আমলে বাংলার আঞ্চলিক জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা সীমিত হলেও, জমিদারি প্রথার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, যা কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের উত্থানের ভিত্তি স্থাপন করে।

২. নবাবি আমল –

১৭শ শতকের শেষ ভাগ থেকে বাংলায় কার্যত স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭-১৭২৭) বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন।

নবাবি আমলে জমিদারদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়ে। কর আদায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রজাশাসনে জমিদাররা প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে থাকে।

কৃষ্ণনগরের জমিদাররা নবাবি দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ সময় রাজপরিবার ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩) নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন। তবে নবাবি শাসনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি একদিকে ইংরেজদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রক্ষা করেন, অন্যদিকে নবাবের আনুগত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) সময় কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ স্থানীয় জমিদাররা ইংরেজ ও নবাব উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেদের ক্ষমতা সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।

৩. ইংরেজ শাসনকাল –

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় নবাবি শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে।

কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের জমিদারি বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

কোম্পানি শাসনের প্রথম পর্বে (১৭৬৫ সালের দেওয়ানি প্রাপ্তি থেকে শুরু করে) জমিদারদের উপর খাজনা আদায়ের ভার পড়ে। এতে অনেক জমিদার জমিদারি হারালেও কৃষ্ণনগর রাজপরিবার টিকে থাকে।

ইংরেজরা কৃষ্ণনগরকে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্ব দেয়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলার সদর শহর হয়।

ইংরেজ শাসনে রাজপরিবার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী থেকে যায়। তারা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও ধর্মীয় কর্ম কাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মুঘল আমলে জমিদারি প্রথার ভিত্তি গড়ে ওঠে, নবাবি আমলে জমিদাররা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়, আর ইংরেজ শাসনে জমিদাররা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব ধরে রাখে। কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার এই ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উত্থান, সংহতি ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থানে পৌঁছেছিল।

2.4. কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ :-

বাংলার ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের অবস্থান শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও অনন্য। বিশেষত আঠারো ও উনিশ শতকে কৃষ্ণনগর হয়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর কেন্দ্রবিন্দু, যার নেতৃত্বে ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার এবং স্থানীয় শিক্ষিত সমাজ। এই সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. সাহিত্যচর্চা -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সাহিত্য ও কাব্যচর্চার বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দরবারে বহু কবি ও সাহিত্যিক সমবেত হতেন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর অনঙ্গদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়।

কৃষ্ণনগরে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, নাটক ও কীর্তনের প্রচলন সাহিত্যিক ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

২. নাট্য ও সংগীতচর্চা -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় নাট্যচর্চার পথিকৃতদের অন্যতম। তিনি নাটকের জন্য আসর বসাতেন এবং নিজেও নাট্যরচনায় উৎসাহ দিতেন।

কৃষ্ণনগরে পালাগান, কীর্তন, যাত্রা ও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসনকালে পাশ্চাত্য ধাঁচের থিয়েটারের প্রভাবও কৃষ্ণনগরে প্রবেশ করে।

৩. চিত্রকলা ও কারুশিল্প –

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত। আঠারো শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্পীদের প্রেরণা দেন, যার ফলে এই পুতুলশিল্প বিশেষ মর্যাদা পায়।

কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা বাস্তবধর্মী ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ হন। ইউরোপীয় ভাস্কর্যশৈলীর প্রভাব এতে লক্ষ করা যায়।

পাশাপাশি আলপনা, নকশিকাঁথা এবং কুমোরশিল্পও কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে।

৪. শিক্ষা ও বৌদ্ধিক চর্চা–

কৃষ্ণনগর ছিল নদীয়া জেলার শিক্ষা ও বিদ্যার কেন্দ্র। নবদ্বীপের প্রাচীন তোলে সংস্কৃত শিক্ষা ও ন্যায়-ব্যাকরণ চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

ইংরেজ আমলে কৃষ্ণনগরে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরি গড়ে ওঠে।

বাংলার নবজাগরণের সময়ে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত সমাজ জাতীয় আন্দোলন ও সংস্কারমূলক কাজে অংশ নেয়।

৫. ধর্ম ও সমাজসংস্কার –

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলনের ঐতিহ্য কৃষ্ণনগরে এখনও প্রবল ছিল। ভক্তিমূলক সংগীত, নামসংকীর্তন ও পূজা-পার্বণ সামাজিক জীবনে গভীর ছাপ ফেলে।

ইংরেজ শাসনে সমাজসংস্কার আন্দোলন যেমন নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত সম্প্রদায় এসব বিষয়ে নেতৃত্ব দেয়।

৬. ইংরেজ শাসনের প্রভাব –

ইংরেজ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা ও আধুনিক শিল্পকলার প্রভাব কৃষ্ণনগরে দেখা যায়।

মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি আংশিকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও, স্থানীয় ঐতিহ্য তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে।

কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ ছিল এক বহুমাত্রিক পুনর্জাগরণ, যেখানে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার সমানতালে বিকাশ লাভ করে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা এ রেনেসাঁর সূচনা করলেও, পরবর্তী কালে ইংরেজ শাসন এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার এটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। এর ফলে কৃষ্ণনগর শুধু নদীয়ার নয়, সমগ্র বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়।

3. কৃষ্ণনগর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (Raja Krishnachandra) :-

3.1. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র: ব্যক্তিগত জীবন ও শাসনকাল :-

বাংলার ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩) ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে জমিদার ও শাসক হিসেবে নবাব ও ইংরেজদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর জীবন ও শাসনকালকে দুই ভাগে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক ভূমিকা।

১. ব্যক্তিগত জীবন -

জন্ম:

কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ সালে নদীয়ার রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন নবদ্বীপ অঞ্চলের জমিদার, পরবর্তীতে কৃষ্ণনগরে এসে রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেন।

শিক্ষা:

শৈশবে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা, ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি সাহিত্যচর্চা ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহী হন।

ধর্মবিশ্বাস:

তিনি ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ। বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মমতে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। কৃষ্ণভক্তি ও কীর্তন তাঁর জীবনের অপরিহার্য অংশ ছিল।

পারিবারিক জীবন:

রাজপরিবারের ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি তিনি পরিবারের উত্তরাধিকার ও রাজ্যের সুষ্ঠু প্রশাসনের দিকে খেয়াল রাখতেন।

২. শাসনকাল :-

(ক) রাজনৈতিক ভূমিকা-

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকাল ছিল নবাবি শাসনের অন্তিম সময় ও ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল।

নবাব সিরাজউদৌলার শাসনামলে তিনি প্রথমে নবাবের অনুগত ছিলেন। কিন্তু নবাব ও ইংরেজদের দ্বন্দ্বে তিনি ধীরে ধীরে ইংরেজদের দিকে ঝুঁকেন।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের সময় কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের গোপন সহযোগিতা করেন। এর ফলে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তিনি জমিদারি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

নবাবদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও বাস্তবে তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হন।

(ক) প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড -

প্রজাদের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সাধারণত সদয়, তবে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার কারণে কখনও কখনও প্রজাদের উপর খাজনার চাপ বৃদ্ধি পেত।

জমিদার হিসেবে তিনি কর সংগ্রহ, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন।

(গ) সাংস্কৃতিক ভূমিকা

তিনি ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পকলার মহান পৃষ্ঠপোষক।

তাঁর দরবারে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো কবি আশ্রয় পান, যিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণনগরে নাট্যচর্চা, সংগীত ও পালাগানের বিস্তার ঘটে তাঁর উৎসাহে। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুল শিল্প তাঁর আমলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়।

ধর্মীয় উৎসব, বিশেষত দুর্গাপূজা, তাঁর সময়ে ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৩. শেষ জীবন ও মৃত্যু –

দীর্ঘ শাসনকাল শেষে ১৭৮৩ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার রাজনৈতিক দিক থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়লেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন এক সংকটকালীন শাসক, যিনি নবাবি ও ইংরেজ শাসনের সংযোগকালে নিজের জমিদারি টিকিয়ে রাখতে কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। একই সঙ্গে তিনি কৃষ্ণনগরকে বাংলার এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনকাল রাজনৈতিক দিক থেকে বিতর্কিত হলেও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্য তাঁকে আজও স্মরণ করা হয়।

3.2. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার সম্পর্ক :-

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ১৮শ শতকের এক বিশিষ্ট জমিদার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সময়ে বাংলার রাজনীতি মূলত দুই শক্তির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল—একদিকে নবাবি দরবার (যার সূচনা করেন মুর্শিদকুলি খাঁ), অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জমিদারি ও প্রভাব অটুট রাখতে এই দুই শক্তির সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

১. মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে সম্পর্ক -

মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭-১৭২৭) ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব, যিনি মুঘলদের কাছ থেকে কার্যত স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর আমলে নদীয়া তথা কৃষ্ণনগরের জমিদারদের কঠোরভাবে রাজস্ব প্রদান করতে হতো।

কৃষ্ণচন্দ্র তখন তরুণ হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা নবাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন, যাতে জমিদারি টিকে থাকে।

মুর্শিদকুলি খাঁর কঠোর করনীতি জমিদারদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেও কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি রক্ষা করেন।

২. সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সম্পর্ক -

সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন।

তাঁর শাসনকাল ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ।

স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি একটি বিতর্কিত চরিত্রে পরিণত হন।

প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের অনুগত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় রাজস্ব ও আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

কিন্তু নবাব ও ইংরেজদের সংঘর্ষ তীব্রতর হলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের নিরাপত্তা ও জমিদারির স্বার্থে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

৩. পলাশীর যুদ্ধ ও কৃষ্ণচন্দ্র :-

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে অংশ নেন বহু বাংলার জমিদার ও অভিজাত।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ না নিলেও, তিনি ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং এর ফলে তাঁর জমিদারি অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪. দ্বৈত সম্পর্কের কূটনীতি -

কৃষ্ণচন্দ্রের কূটনৈতিক দক্ষতা এখানেই প্রতিফলিত হয় যে, তিনি একদিকে নবাবি দরবারে আনুগত্য প্রদর্শন করতেন, অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গোও ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেছিলেন।

এই দ্বৈত নীতি তাঁকে রাজনৈতিক টিকে থাকার সুযোগ দেয়। তবে ইতিহাসের বিচারে অনেকেই তাঁকে সিরাজউদ্দৌলার পতনের সহায়ক হিসেবে সমালোচনা করেছেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁর সম্পর্ক ছিল মূলত রাজস্ব ও জমিদারি রক্ষার ভিত্তিতে, আর সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হয়েছিল আনুগত্যের মাধ্যমে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশের কারণে ভেঙে যায়। এর ফলে তিনি জমিদারি রক্ষা করতে সক্ষম হলেও বাংলার

3.3. পলাশীর যুদ্ধের আগে ও পরে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা :-

বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এক জলবিভাজিকা। এই যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের সূচনা হয়। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের আগে ও পরে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা এবং সমকালীন বাংলার রাজনীতির জটিলতাকে প্রতিফলিত করে।

১. পলাশীর যুদ্ধের আগে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা -

নবাবের প্রতি আনুগত্য: সিরাজউদ্দৌলার ক্ষমতায় আসার পর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। জমিদার হিসেবে তিনি রাজস্ব প্রদান ও প্রজাশাসনে নবাবি প্রশাসনের প্রতি সহযোগিতা বজায় রাখতেন।

অবিশ্বাস ও দ্বিধা: নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র বিভ্রান্ত অবস্থায় পড়েন। একদিকে নবাবের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য, অন্যদিকে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ: যুদ্ধের আগে থেকেই কৃষ্ণচন্দ্র গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—যে পক্ষ বিজয়ী হবে, সেই পক্ষের অনুগত হয়ে নিজের জমিদারি রক্ষা করা।

ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ: ঐতিহাসিকদের মতে, মীর জাফর, জগতশেঠ ও অন্যান্য বাংলার অভিজাতদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, তবু তাঁর নীরব সহযোগিতা নবাবের জন্য ক্ষতিকর হয়।

২. পলাশীর যুদ্ধ চলাকালীন ভূমিকা -

কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য নিয়ে অংশ নেননি।

তবে যুদ্ধের খবর সংগ্রহ, ইংরেজদের পক্ষে মনোভাব রাখা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

নবাবের পরাজয় যে অনিবার্য, তা তিনি আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন।

৩. পলাশীর যুদ্ধের পরে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা -

ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য: যুদ্ধের পরপরই কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের অনুগত হয়ে পড়েন। এতে তাঁর জমিদারি ও সম্পত্তি অক্ষত থাকে।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি: ইংরেজরা তাঁকে “বিশ্বস্ত মিত্র” হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে অন্য অনেক জমিদার যেখানে ক্ষমতা হারান, কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেন।

রাজনৈতিক কৌশল: তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর। তাই ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে তিনি রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকেন।

সাংস্কৃতিক আশ্রয়দাতা হিসেবে ভূমিকা: যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তাঁর দরবারই হয়ে ওঠে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো কবি এই সময়েই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পান।

৪. সমালোচনা ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

কৃষ্ণচন্দ্রকে অনেক ঐতিহাসিক ‘স্বার্থরক্ষাকারী জমিদার’ হিসেবে আখ্যা দেন। কারণ, তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নবাবের পাশে দাঁড়াননি।

আবার অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তিনি ছিলেন এক বাস্তববাদী শাসক, যিনি রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে নিজের জমিদারি ও প্রজাদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই তিনি একই সঙ্গে সমালোচিত ও প্রশংসিত—সমালোচিত বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য, আর প্রশংসিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্য।

পলাশীর যুদ্ধের আগে কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, আর যুদ্ধের পর তিনি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজপন্থী হয়ে ওঠেন। এই সিদ্ধান্ত তাঁকে জমিদার হিসেবে নিরাপদ রাখলেও বাংলার বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তাঁর দরবারে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ কৃষ্ণনগরকে এক বিশেষ মর্যাদা দেয়।

3.4. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি :-

বাংলার ইতিহাসে ১৮শ শতক ছিল এক অস্থির ও পরিবর্তনশীল সময়। নবাবি শাসনের পতন, পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আমূল বদলে দেয়। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারী। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কূটনৈতিক, বাস্তববাদী এবং অনেকাংশে বিতর্কিত।

১. সম্পর্কের সূচনা-

কৃষ্ণচন্দ্র মূলত নবাবি দরবারের অনুগত জমিদার হিসেবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

কিন্তু নবাবি প্রশাসনের দুর্বলতা এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাঁকে নতুন কৌশল গ্রহণে বাধ্য করে।

কোম্পানির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন কূটনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে—যাতে জমিদারি অক্ষত থাকে এবং সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানো যায়।

২. পলাশীর যুদ্ধের পূর্বপর্বে সম্পর্ক-

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হলে কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিধায় পড়েন।

একদিকে নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, অন্যদিকে ইংরেজদের জয় অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের (মীর জাফর, জগতশেঠ প্রমুখ) পরোক্ষ সমর্থন দেন।

৩. পলাশীর যুদ্ধ-পরবর্তী সম্পর্ক -

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কৃষ্ণচন্দ্র দ্রুত ইংরেজদের অনুগত হয়ে পড়েন।

এর ফলে তাঁর জমিদারি অক্ষত থাকে, বরং ইংরেজরা তাঁকে পুরস্কৃত করে “বিশ্বস্ত সহযোগী” হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানান এবং নবাবি শাসনের অবসানকে মেনে নেন।

৪. অর্থনৈতিক দিক -

ইংরেজরা বাংলার অর্থনীতিকে ক্রমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়, বিশেষত রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে।

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের জমিদারি থেকে স্থায়ী আয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

তবে এতে প্রজাদের উপর করের চাপ বেড়ে যায়, যা মাঝে মাঝে অসন্তোষের জন্ম দেয়।

৫. সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব -

ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কৃষ্ণচন্দ্র রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ হলেও তাঁর সাংস্কৃতিক ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তিনি কোম্পানির সান্নিধ্যে থেকে পশ্চিমা আধুনিকতার কিছু দিক গ্রহণ করেন, যদিও নিজস্ব বৈষ্ণব ঐতিহ্যকেও সমান গুরুত্ব দেন।

কৃষ্ণনগরের নাটক, কবিতা, সংগীত ও মাটির পুতুলশিল্প এই সময়ে ইংরেজদের কৌতূহল জাগায় এবং আঞ্চলিক শিল্প আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে।

৬. সমালোচনা –

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয়েছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক কৌশলকে অনেক সময় “স্বার্থরক্ষার রাজনীতি” বলা হয়।

তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী নেতা, যিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের জমিদারি, প্রজা ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত অধ্যায়। একদিকে তিনি স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন, যা বাংলার স্বাধীনতার পরাজয়ে সহায়ক হয়। অন্যদিকে, তাঁর সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা কৃষ্ণনগরকে বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে তাঁকে একই সঙ্গে সমালোচিত ও শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে স্মরণ করা হয়।

3.5. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন সমাজে প্রভাব :-

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩) কেবলমাত্র এক জন জমিদার বা রাজনৈতিক চরিত্র নন, তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সমাজজীবনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর শাসনকাল নবাবি শাসনের পতন ও ইংরেজ শাসনের সূচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে তাঁর কর্মকাণ্ড, দৃষ্টিভঙ্গি ও পৃষ্ঠপোষকতা সমকালীন সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১. রাজনৈতিক প্রভাব -

ইংরেজপন্থী ভূমিকা:

পলাশীর যুদ্ধের সময় ও পরবর্তী কালে কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখেন। এর ফলে তিনি জমিদারি রক্ষা করতে পারলেও বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।

অন্যান্য জমিদারদের উপর প্রভাব: তাঁর এই বাস্তববাদী কৌশল অনেক জমিদারকে ইংরেজপন্থী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে ধীরে ধীরে বাংলার রাজনীতিতে নবাবদের প্রভাব কমে যায়।

প্রশাসনিক দৃষ্টান্ত: জমিদারি টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি যে করনীতি ও প্রজাশাসন চালু করেছিলেন, তা আশেপাশের অঞ্চলেও অনুসরণ করা হয়।

২. সামাজিক প্রভাব -

প্রজাদের জীবনে প্রভাব: ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করে জমিদারি বজায় রাখলেও প্রজাদের উপর করের চাপ বৃদ্ধি পায়। তবে তিনি সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় উৎসবে প্রজাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতেন।

ধর্মীয় প্রভাব:

বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রতি তাঁর অনুরাগ সমাজে ধর্মীয় ভক্তি আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়। কীর্তন, রাসযাত্রা, দুর্গোৎসব ইত্যাদি উৎসব আরও জনপ্রিয় হয়।

সামাজিক সমন্বয়:

তাঁর দরবারে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কবি, শিল্পী—সবাই সমান মর্যাদা পেতেন, যা সমকালীন সমাজে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরি করে।

৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রভাব –

সাহিত্যচর্চা:

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো কবিকে তিনি আশ্রয় দেন। অন্নদামঙ্গল কাব্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়, যা সমকালীন সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলে।

নাট্যচর্চা:

কৃষ্ণচন্দ্র নাট্যআসর বসাতেন। এর ফলে কৃষ্ণনগর বাংলার নাট্যকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নাটক-সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

শিল্পকলায় প্রভাব:

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শিল্প তাঁর আমলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। এটি স্থানীয় কারিগর সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

৪. অর্থনৈতিক প্রভাব –

ইংরেজদের সহযোগিতায় জমিদারি রক্ষা করলেও প্রজাদের উপর করের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জমিদারির আয় দিয়ে তিনি সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল রাখত।

কৃষিশিল্প ও কারুশিল্পে তাঁর উৎসাহ সমকালীন অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

৫. নৈতিক ও দার্শনিক প্রভাব-

কৃষ্ণচন্দ্রের বাস্তববাদী রাজনীতি সমকালীন সমাজে দ্বৈত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একদল মানুষ তাঁকে “প্রজাহিতৈষী ও সংস্কৃতিপ্রেমী” হিসেবে দেখত। অন্যদল তাঁকে “স্বার্থরক্ষাকারী ও ইংরেজপন্থী” হিসেবে সমালোচনা করত। এই দ্বৈত প্রতিক্রিয়াই বাংলার সমাজে নতুন রাজনৈতিক ও নৈতিক আলোচনার জন্ম দেয়।

সমকালীন সমাজে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব ছিল বহুমুখী। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি ইংরেজ আধিপত্যকে শক্তিশালী করেছিলেন, সামাজিকভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবকে জনপ্রিয় করেছিলেন, আর সাংস্কৃতিকভাবে কৃষ্ণনগরকে বাংলার অন্যতম রেনেসাঁ-কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তাই তাঁর প্রভাবকে একদিকে ইতিবাচক (সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়ন), অন্যদিকে নেতিবাচক (বাংলার স্বাধীনতার পথে অন্তরায়) হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।

4. কৃষ্ণনগর রাজা ও সমাজসংস্কৃতি (Social & Cultural Contributions) :-

4.1. কৃষ্ণনগর রাজা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যচর্চা :-

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩) কেবল জমিদার বা রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সংস্কৃতিপ্রেমী ও শিল্পপৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনকালেই কৃষ্ণনগর বাংলার অন্যতম সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১. সাহিত্যচর্চা-

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর:

কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ছিলেন ভারতচন্দ্র। তিনি রচনা করেন অন্নদামঙ্গল কাব্য, যা বাংলার মঙ্গলকাব্যের ধারায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই কাব্য কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক নয়, বরং সমকালীন সমাজজীবন ও মানবিক আবেগও এতে প্রতিফলিত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র কবিদের আশ্রয় দিয়ে তাঁর দরবারকে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র করে তোলেন। ফলে গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সাহিত্যচর্চার নতুন ধারা বিস্তার লাভ করে।

ধর্মীয় সাহিত্য:

বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন ও ভক্তিমূলক কবিতা রচনায়ও তিনি উৎসাহ দেন। এর মাধ্যমে সমাজে ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটে।

২. সঙ্গীতচর্চা -

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। তাঁর দরবারে বৈষ্ণব কীর্তন, পদাবলী গীতি ও ধ্রুপদী সঙ্গীত পরিবেশিত হতো।

তিনি কীর্তন ও ভজনগানের আসর বসাতেন, যেখানে সাধারণ মানুষ থেকে অভিজাত সবাই অংশ নিতে পারতেন।

সঙ্গীতের এই ধারার ফলে কৃষ্ণনগর সমাজে ধর্মীয় ভক্তি, আনন্দ ও সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

অনেক গবেষকের মতে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগরে সঙ্গীতশিল্পীদের এক বিশেষ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যারা পরে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করে।

৩. নাট্যচর্চা –

কৃষ্ণচন্দ্রকে বলা হয় বাংলায় আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম পথিকৃত।

তাঁর সময়ে কৃষ্ণনগরে নাট্যআসর বসত, যেখানে পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় আখ্যান ও সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক পরিবেশিত হতো।

নাটক কেবল রাজদরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; উৎসব, রাসযাত্রা ও দুর্গোৎসবের সময় নাট্যপ্রদর্শনী সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করত।

নাটকের এই চর্চা পরবর্তী সময়ে বাংলার আধুনিক নাট্য আন্দোলনের ভিত গড়ে দেয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগর বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁর দরবারে ভারতচন্দ্রের মতো কবি, বৈষ্ণব সঙ্গীত ও নাট্যআসর কৃষ্ণনগরকে এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁয় পৌঁছে দেয়। ফলে তিনি আজও স্মরণীয়, কেবল রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে নয়, বরং বাংলার সংস্কৃতির মহাপৃষ্ঠপোষক হিসেবেও।

4.2. কৃষ্ণনগর রাজা ও কীর্তন, ব্রজবুলি ও পদাবলি কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকতা :—

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেবল রাজনৈতিক চরিত্র নন, তিনি ছিলেন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলে বিশেষত কীর্তন, ব্রজবুলি সাহিত্য, এবং পদাবলি কীর্তন নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এ তিনটি ধারাই বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং গ্রামীণ থেকে অভিজাত সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১. কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকতা –

কীর্তন মূলত বৈষ্ণব ধর্মীয় আচার ও সংগীতের প্রধান অংশ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা গীত ও গাওয়া হতো।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজের রাজপ্রাসাদে ও বিভিন্ন উৎসবে কীর্তনের আসর বসাতেন। এর ফলে কীর্তন কেবল ধর্মীয় ভক্তির প্রকাশ নয়, সমাজে এক প্রকার বিনোদন ও ঐক্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

রাজপরিবারের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় কীর্তনদল ও গায়কদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতিও ঘটে।

২. ব্রজবুলি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা –

ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা, যা মূলত মৈথিলী ও বাংলার সংমিশ্রণে গঠিত। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিরা এ ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবুলি ভাষার পদাবলিকে কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে জনপ্রিয় করে তোলেন।

তঁার রাজসভায় কবি ও পদকর্তারা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ গাইতেন, যা একদিকে আধ্যাত্মিক ভক্তি প্রকাশ করত, অন্যদিকে শিল্পরসিক সমাজকে আনন্দ দিত।

৩. পদাবলি কীর্তনের প্রসার –

পদাবলি কীর্তন মানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলা অবলম্বনে গাওয়া গান। এগুলি সাধারণত বৈষ্ণব কবিদের রচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র পদাবলি কীর্তনকে রাজদরবার থেকে জনসমাজে ছড়িয়ে দেন। উৎসব, রাসযাত্রা ও দুর্গোৎসবে পদাবলি কীর্তনের বিশেষ আসর বসত। এর ফলে কৃষ্ণনগর বৈষ্ণব সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

৪. সামাজিক প্রভাব –

কীর্তন, ব্রজবুলি ও পদাবলি কীর্তনের মাধ্যমে সমাজে একধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষ এই আসরে যুক্ত হয়ে সামাজিক সংহতি বজায় রাখত। কীর্তন সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ, ভক্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করেছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগরে কীর্তন, ব্রজবুলি ভাষার পদ ও পদাবলি কীর্তন অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করে। তঁার রাজসভা শুধু রাজনৈতিক কেন্দ্র নয়, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এর প্রভাব সমকালীন সমাজ ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সমৃদ্ধ করেছে।

4.3. কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প (Krishnanagar Clay Dolls) :-

কৃষ্ণনগরের রাজাদের বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮৩) সময় থেকে এক অনন্য শিল্পধারা বিকশিত হয়, যা আজও বিশ্বব্যাপী পরিচিত—কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বা মাটির পুতুল। এই শিল্প শুধু কারিগরদের সৃজনশীলতাই নয়, বরং কৃষ্ণনগরের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছিল।

১. উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক পটভূমি -

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সূচনা হয়েছিল মূলত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের উৎসাহিত করেছিলেন দেবমূর্তি, খেলনা ও প্রতিকৃতি তৈরিতে।

প্রথমদিকে এগুলি ছিল ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত মূর্তি, তবে ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের চরিত্র, প্রাণী ও সামাজিক দৃশ্যও প্রতিফলিত হতে শুরু করে।

২. বৈশিষ্ট্য -

বাস্তবতা (Realism): কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর জীবন্ত রূপ। পুতুলগুলো দেখতে প্রায় বাস্তব মানুষের মতো লাগে।

বিষয়ের বৈচিত্র্য: কৃষক, মৎস্যজীবী, দারোয়ান, পন্ডিত, ইংরেজ সাহেব-মেমসাহেব, পাখি-প্রাণী, পৌরাণিক চরিত্র ইত্যাদি নানা রকমের প্রতিকৃতি এই শিল্পে তৈরি হতো।

রঙের ব্যবহার: উজ্জ্বল ও প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার পুতুলগুলোকে জীবন্ত করে তোলে।

আকারে ছোট কিন্তু নিখুঁত: সাধারণত এরা ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও সূক্ষ্মতার জন্য বিখ্যাত।

৩. রাজপৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশ -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃৎশিল্পীদের প্রাসাদের কাছে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন, যাতে তাঁরা সহজে শিল্পচর্চা করতে পারেন।

উৎসব, বিশেষত দুর্গাপূজা ও রাসযাত্রার সময় এই মৃৎশিল্পের ব্যবহার ছিল ব্যাপক।

ইউরোপীয় প্রভাব:

ঔপনিবেশিক আমলে সাহেব-সুবেদের প্রতিকৃতি মাটির পুতুলে প্রতিফলিত হতে শুরু করে, যা বিদেশিদের কাছেও বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব -

সমাজের প্রতিচ্ছবি: কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সমকালীন সমাজের এক জীবন্ত দলিল। পোশাক-আশাক, জীবনধারা, পেশা—সবকিছুই এতে ফুটে ওঠে।

ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানো: দেবমূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে ধর্মীয় আচার ও পূজা-পার্বণের চাহিদা পূরণ হতো।

বিনোদন ও শিক্ষার উপাদান: শিশুদের খেলনা হিসেবে এবং সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক শেখানোর মাধ্যম হিসেবেও এ পুতুল ব্যবহৃত হতো।

৫. অর্থনৈতিক গুরুত্ব -

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প স্থানীয় অর্থনীতির এক বড় অবলম্বন ছিল। দেশীয় বাজার ছাড়াও ঔপনিবেশিক সময়ে বিদেশি বাজারেও এর চাহিদা তৈরি হয়।

আজও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প স্থানীয় কারিগর পরিবারের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম ভরসা।

৬. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি -

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ভারতীয় হস্তশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এগুলি বিশ্বজুড়ে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে যে ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল, তা আজও জীবন্ত। এ শিল্প সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে সমর্থন করে। তাই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল কেবল শিল্প নয়, বরং ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অমূল্য দলিল।

4.4. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার (কৃষ্ণনগর রাজাদের অবদান) :-

কৃষ্ণনগরের রাজারা, বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩), শুধুমাত্র জমিদারি বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নদীয়া জেলা প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত হলেও কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে এর বিস্তার নতুন মাত্রা পায়।

১. প্রাচীন নদীয়ার বিদ্যাচর্চার ধারা -

নদীয়া অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত পণ্ডিত ও টোলশিক্ষার জন্য খ্যাত ছিল। এখানে ব্যাকরণ, যুক্তি, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা ইত্যাদি বিদ্যার চর্চা হতো।

কৃষ্ণনগরের রাজারা এই বিদ্যাচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেন।

২. টোল ও পাঠশালা স্থাপন -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু সংস্কৃত টোল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা নেন। এ সব টোলে ন্যায়, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান হতো।

অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত কৃষ্ণনগরে আশ্রয় পান এবং তাঁদের বিদ্যার আলো সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

৩. সাহিত্যচর্চার প্রসার -

রাজদরবারে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো খ্যাতনামা কবিরা আশ্রয় পান। অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার পেছনে কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব পদাবলি, কীর্তন ও ব্রজবুলি সাহিত্যের প্রসার ঘটানোতেও তিনি ভূমিকা রাখেন।

৪. নাট্যচর্চা ও সঙ্গীতশিক্ষা -

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নাট্যপ্রেমী। তাঁর প্রাসাদে নাট্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। নাটক, পালাগান ও যাত্রার আসর বসিয়ে তিনি লোকশিক্ষা ও বিনোদনের সমন্বয় ঘটান।

সঙ্গীতশিল্পীদের তিনি আর্থিক সহায়তা দিতেন, ফলে কৃষ্ণনগরে কীর্তন ও পদাবলির পাশাপাশি ধ্রুপদী সঙ্গীতও প্রসারিত হয়।

৫. সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার -

দুর্গোৎসব, রাসযাত্রা, কীর্তন ও ধর্মীয় সভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার বিস্তার ঘটত।

সমাজে ভক্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ স্থাপনে রাজাদের এই উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

৬. ইউরোপীয় প্রভাব ও আধুনিক শিক্ষার সূচনা -

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কৃষ্ণনগরে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পড়তে শুরু করে।

ইউরোপীয় মিশনারিরা বিদ্যালয় স্থাপন করলে কৃষ্ণনগরের রাজারা সেগুলিকে সহায়তা দেন।

এর ফলে বাংলা ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে কৃষ্ণনগর আধুনিক শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়।

৭. সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্র হিসেবে কৃষ্ণনগর -

সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পকলা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগর ১৮শ শতকে এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রাজদরবার থেকে শুরু করে সাধারণ সমাজ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করে।

কৃষ্ণনগরের রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে অমূল্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নদীয়ার টোলশিক্ষা, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্পকলার ঐতিহ্য এতটা সমৃদ্ধ হতো না। বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার সমাজকে এক নতুন সাংস্কৃতিক উচ্চতায় পৌঁছে দেন, যা ভবিষ্যতের নবজাগরণের ভিত গড়ে দেয়।

5. সমালোচনা ও বিতর্কিত দিক (Criticism & Controversies) :-

5.1. প্লাসির ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণনগর রাজাদের ভূমিকা :-

১৭৫৭ সালের প্লাসির যুদ্ধ কেবল বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের পেছনে ছিল এক জটিল ষড়যন্ত্র, যেখানে বাংলার অনেক জমিদার, মহাজন ও রাজন্যবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে আলোচিত।

১. নবাব সিরাজউদৌলার সঙ্গে দ্বন্দ্ব -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সিরাজউদৌলার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে পারেননি। সিরাজ ছিলেন কঠোর রাজস্ব নীতির প্রবক্তা, ফলে জমিদারদের অনেক সুবিধা কেটে যায়। কৃষ্ণনগরের রাজাও তাঁর নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এতে অসন্তোষ বাড়ে।

২. ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত -

সমসাময়িক বর্ণনা অনুযায়ী, কৃষ্ণচন্দ্র নবাববিরোধী মহাজনদের মতো ইংরেজদের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ রাখতেন।

মীরজাফরের ষড়যন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি অর্থসাহায্য ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

এর ফলে ইংরেজরা বাংলার জমিদার শ্রেণিকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়।

৩. আর্থিক ভূমিকা -

প্লাসির ষড়যন্ত্রে অর্থ যোগান ছিল প্রধান উপাদান। কৃষ্ণনগরের রাজা তাঁর

বিপুল ধনসম্পদ থেকে ইংরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে হওয়া চুক্তিকে বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই অর্থসাহায্যই নবাববিরোধী ষড়যন্ত্রকে আরও দৃঢ় করে।

৪. ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা -

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের জমিদারি ও প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা।

সিরাজের কড়া রাজস্ব নীতি থেকে মুক্তি পেতে তিনি ইংরেজ ও মীরজাফরের পাশে দাঁড়ান।

এ কারণে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, তিনি জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

৫. ঐতিহাসিক বিতর্ক -

কিছু ইতিহাসবিদ তাঁকে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম দোষী বলে আখ্যায়িত করেন।

আবার অন্যপক্ষ যুক্তি দেন, তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনেক জমিদারের মতোই তিনি ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন, যা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর এই ভূমিকা বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল।

5.2. ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত নিয়ে সমালোচনা :-

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর সাংস্কৃতিক অবদানের পাশাপাশি ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাতের প্রসঙ্গও বিতর্কিত হয়ে ওঠে।

অনেক ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে এ আঁতাত তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সমালোচনাযোগ্য দিক।

১. জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন ইংরেজদের প্রতিপক্ষ। তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ মানেই ছিল বিদেশি শক্তির বিস্তার রোধ।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ব্যক্তিগত জমিদারি স্বার্থ রক্ষার জন্য নবাবের বিরোধিতা করে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন।

এর ফলে ইংরেজরা সহজে বাংলার রাজনৈতিক ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

২. ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা -

প্লাসির ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণনগর রাজা প্রত্যক্ষভাবে কতটা যুক্ত ছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে।

তবে সমসাময়িক নথি ও ইংরেজদের চিঠিপত্রে ইঙ্গিত মেলে যে, তিনি অর্থসাহায্য ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন।

এ কারণে তাঁকে অনেক ঐতিহাসিক "ইংরেজ শাসনের সহায়ক জমিদার" বলে অভিহিত করেছেন।

৩. প্রজাদের অসন্তোষ -

সাধারণ প্রজারা নবাবের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না রাখলেও, ইংরেজ শাসন কায়েমের ফলে তাঁদের উপর নতুন করে শোষণ নেমে আসে। কৃষ্ণচন্দ্রের আঁতাতকে প্রজারা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হিসেবে দেখেছিলেন।

ইংরেজদের শোষণমূলক নীতি কার্যকর হতেই প্রজাদের জীবনে কর-দায় ও দারিদ্র্য আরও বেড়ে যায়।

৪. সমকালীন সমালোচনা -

বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক মহল কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরেজপ্রীতিকে নিন্দা করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে "দেশদ্রোহী জমিদার" হিসেবে অভিহিত করেন। এর ফলে তাঁর সাংস্কৃতিক অবদান অনেক সময় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়।

৫. ঐতিহাসিক মূল্যায়নে দ্বন্দ্ব –

কিছু গবেষক মনে করেন, কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না; ইংরেজরা তখন এক অপরিহার্য শক্তি।

অন্যদিকে সমালোচকরা বলেন, তিনি যদি নবাব ও দেশীয় শক্তিকে সমর্থন করতেন, তাহলে বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্তত কিছুটা ভিন্ন হতে পারত। তাই তাঁকে কেবল একজন শিল্পপৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয়, ইংরেজ শাসন বিস্তারের সহযোগী হিসেবেও মনে রাখা হয়।

5.3. জমিদারি শোষণ ও প্রজাদের অবস্থা :–

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণনগর জমিদারিতে যেমন শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি জমিদারি শোষণ ও প্রজাদের দুর্দশার কথাও সমানভাবে আলোচিত হয়। জমিদারি প্রথা ছিল মুঘল আমল থেকেই চালু, কিন্তু ১৮শ শতকে এসে এ ব্যবস্থা ক্রমশ শোষণমূলক রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

১. জমিদারি ব্যবস্থার প্রকৃতি –

জমিদারের মূল দায়িত্ব ছিল প্রজা থেকে খাজনা সংগ্রহ করে নবাব বা ইংরেজ সরকারের কোষাগারে পাঠানো। কৃষ্ণচন্দ্রও এই নীতি অনুসরণ করে কঠোর রাজস্ব আদায় চালু রাখেন। খাজনা না দিতে পারলে কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত হত বা তাদের উপর নানা ধরনের দণ্ড চাপানো হতো।

২. প্রজাদের উপর আর্থিক চাপ –

প্রজাদের জীবনযাত্রা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খারাপ ফলনের সময়েও খাজনা মকুব করা হতো না। কৃষকেরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো, ফলে ঋণ ও সুদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ত। একসময় জমি হারিয়ে বহু কৃষক বর্গাদার বা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

৩. দুর্ভিক্ষ ও অনাহার -

১৮শ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তবুও জমিদারি খাজনা আদায় বন্ধ হয়নি। কৃষ্ণনগরের প্রজাদের দুরবস্থা তখন ভয়াবহ রূপ নেয়, অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন।

৪. বিলাসিতা বনাম প্রজাদের দুঃখ -

কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভায় নাটক, কীর্তন, ব্রজবুলি পদগান ও মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু প্রজাদের দুর্দশার সময় তাঁর এ বিলাসিতা সমালোচনার জন্ম দেয়। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, প্রজাদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে তিনি ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য ও সাংস্কৃতিক জৌলুসে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

৫. সামাজিক প্রভাব -

প্রজাদের উপর জমিদারি শোষণ সমাজে এক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। কৃষকেরা জমিদারের প্রতি আস্থা হারায় এবং ধীরে ধীরে বিদ্রোহী মনোভাব জন্ম নিতে শুরু করে।

এর ফলশ্রুতিতে বাংলায় ইংরেজ আমলে কৃষক বিদ্রোহের জমি তৈরি হয়।

৬. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন -

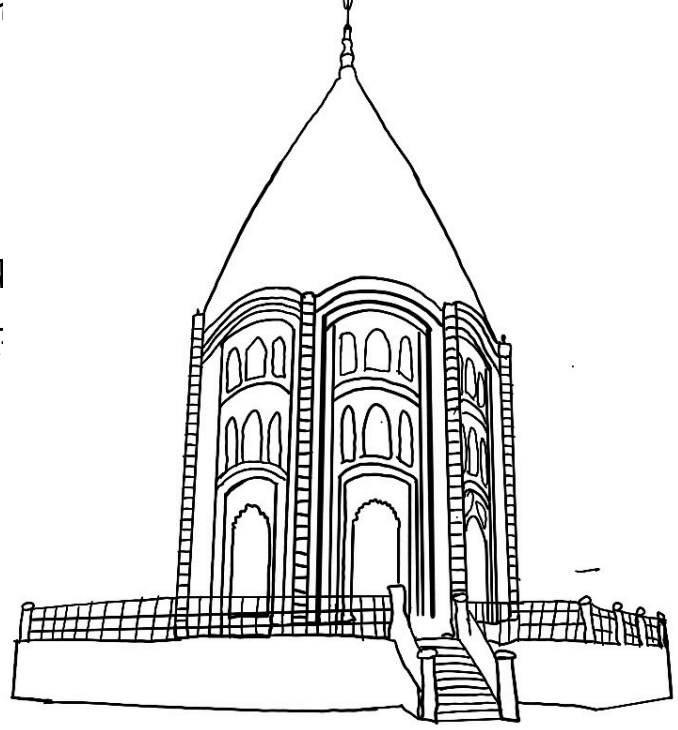
সমালোচকরা বলেন, কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের পরিবর্তে নিজের জমিদারি ক্ষমতা অটুট রাখতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অপরদিকে সমর্থকরা যুক্তি দেন, তৎকালীন শাসনব্যবস্থায় জমিদারের হাতে খুব বেশি স্বাধীনতা ছিল না; তিনি নিজেও নবাব ও পরে ইংরেজ সরকারের কাছে বাধ্য ছিলেন। তাই তাঁর এই শোষণমূলক নীতি একদিকে সময়ের প্রেক্ষাপটে বাধ্যতামূলক হলেও অন্যদিকে প্রজাদের দুর্দশা বাড়িয়েছিল, যা সমালোচনার যোগ্য।

6. মন্দির স্থাপন (Temple construction) :-

6.1. শিব নিবাস ও স্থাপত্যচর্চায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজার ভূমিকা:-

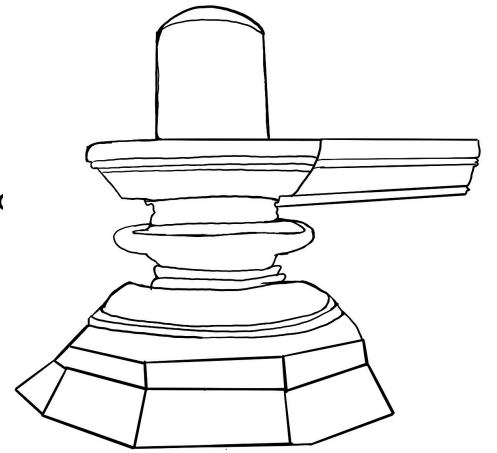
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেবল সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর রাজত্বকালে কৃষ্ণনগরে বহু মন্দির, প্রাসাদ ও উদ্যান নির্মিত হয়েছিল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদে ১০৮ টি শিব মন্দির তৈরি করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এই মন্দিরগুলি মূলত রাম ও সীতার এবং মহাদেবের প্রতি ভক্তি নিবেদনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। যার মধ্যে “শিব নিবাস” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিবনিবাস মন্দির নির্মাণ করেন, যা একটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ 'রাজরাজেশ্বর' মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। তিনি তাঁর পুত্র শিবচন্দ্র-র নামে এই মন্দিরটি উৎসর্গ করেন এবং তাঁর নামে শিবলিঙ্গের নামকরণ করা হয়।



শিব নিবাস Temple

১. শিব নিবাসের ধারণা ও নির্মাণ—

কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ছিলেন একজন গভীর ধর্মপ্রাণ হিন্দু শাসক। তিনি শৈব উপাসনায় অনুরাগী ছিলেন এবং রাজসভায় শিবপূজার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই কারণে তিনি কৃষ্ণনগরে এক বৃহৎ স্থাপত্যকীর্তি “শিব নিবাস” নির্মাণ করেন, যা ছিল শিবকে নিবেদিত এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।



শিবলিঙ্গটি ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতার এবং ৩৬ ফুট চওড়া একটি বিশালকষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ রয়েছে, যা এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বলে পরিচিত।

২. স্থাপত্যশৈলী-

শিব নিবাস ছিল নবরত্ন বা পঞ্চরত্ন শৈলীর অনুকরণে নির্মিত, যেখানে বাংলা মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে মুঘল-ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণ দেখা যায়। ইট, চুন-সুরকি ও টেরাকোটার অলঙ্করণে তৈরি এই স্থাপনাটি নকশার দিক থেকে অনন্য ছিল। এর দেওয়ালে পৌরাণিক কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য ও শিব-পার্বতীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব—

শিব নিবাস কেবল মন্দির ছিল না; এটি ছিল কৃষ্ণনগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এখানে শিবরাত্রি, দোলযাত্রা ও অন্যান্য হিন্দু উৎসব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। ব্রাহ্মণ, কীর্তনিয়া, নাট্যশিল্পী ও সাধারণ প্রজারা এই মন্দিরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

৪. কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা —

শিব নিবাস নির্মাণে রাজা নিজে উদ্যোগী ছিলেন এবং প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। তিনি স্থপতি ও কারিগরদের কলকাতা, নদিয়া ও বর্ধমান অঞ্চল থেকে নিয়ে এসে এখানে নিযুক্ত করেন। এ স্থাপনাটিকে তিনি কৃষ্ণনগরের আধ্যাত্মিক গৌরব ও রাজকীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

৫. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন —

শিব নিবাস কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্মীয় অনুরাগ, স্থাপত্যরুচি ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সমালোচকদের মতে, প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সময়েও রাজা বিপুল অর্থ খরচ করে এ ধরনের স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন, যা তাঁর বিলাসিতা ও ব্যক্তিগত ধর্মীয় আসক্তির দিকটি প্রকাশ করে।

অন্যদিকে সমর্থকরা বলেন, এই ধরনের স্থাপত্যই কৃষ্ণনগরকে বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছিল।

7. উপসংহার (Conclusion) :-

7.1. কৃষ্ণনগর রাজাদের উত্তরাধিকার (Legacy of the Krishnanagar Rajas):-

কৃষ্ণনগর রাজবংশ, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কাল, বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁদের উত্তরাধিকার কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, মৃৎশিল্প, স্থাপত্য ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত বিস্তৃত।

১. সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার –

সাহিত্য ও নাটকচর্চা :

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নাট্যশালা নির্মাণ এবং নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা কৃষ্ণনগরকে বাংলার নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র করে তোলে।

সঙ্গীত ও কীর্তন :

ব্রজবুলি পদাবলি কীর্তন ও বৈষ্ণব সঙ্গীতচর্চায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে আজও অমলিন।

মৃৎশিল্প :

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুল আজও বিশ্বজুড়ে পরিচিত, যা মূলত কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পৃষ্ঠপোষকতার ফল।

২. স্থাপত্য উত্তরাধিকার –

কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত শিব নিবাসসহ বিভিন্ন মন্দির ও রাজপ্রাসাদ আজও ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে মুঘল ও ইউরোপীয় প্রভাবের সমন্বয় তাঁর আমলের স্থাপনাগুলোতে দেখা যায়। এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলো কৃষ্ণনগরকে আজও একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. রাজনৈতিক উত্তরাধিকার –

প্লাসির ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা ও ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত কৃষ্ণনগর রাজাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে বিতর্কিত করে তুলেছে। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর হলেও, জমিদারি শক্তিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়েছিল। এই উত্তরাধিকার থেকেই বোঝা যায়, কৃষ্ণনগর রাজারা মূলত আঞ্চলিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

৪. সামাজিক উত্তরাধিকার –

জমিদারি প্রথার কারণে কৃষ্ণনগরের প্রজাদের উপর শোষণ ও দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল।

ফলে কৃষ্ণনগর রাজাদের নাম সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়; বরং শোষণের প্রতীক হিসেবেই ইতিহাসে বেশি আলোচিত। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা।

৫. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন –

কৃষ্ণনগর রাজাদের উত্তরাধিকার এক দ্বৈত চিত্র বহন করে— একদিকে তাঁরা ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নাটক ও মৃৎশিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক। অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন ইংরেজ শাসন বিস্তারের সহযোগী ও জমিদারি শোষণের প্রতীক। ফলে তাঁদের উত্তরাধিকার আজও এক বিতর্কিত ঐতিহ্য, যা বাংলার ইতিহাসে একই সঙ্গে গৌরব ও সমালোচনার যোগসূত্র বহন করে।

7.2. বর্তমান কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে কৃষ্ণনগর রাজাদের অবদান:-

কৃষ্ণনগর আজও বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। এ শহরের ঐতিহ্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ও উৎসবের মূলে রয়েছে কৃষ্ণনগর রাজাদের বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অবদান। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা আজও কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে জীবন্ত করে রেখেছে।

১. কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প -

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বা ক্লে ডলস আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এর মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি স্থানীয় কারিগরদের উন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন। আজও কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিপাড়া ও আশেপাশের গ্রামগুলো এই ঐতিহ্যের ধারক, যা উৎসব ও প্রদর্শনীতে সারা বিশ্বে পরিচিত।

২. সঙ্গীত ও কীর্তনচর্চা -

ব্রজবুলি পদাবলি কীর্তন, বৈষ্ণব পদগান ও শাস্ত্রীয় সংগীত কৃষ্ণনগরের এক পরিচয়।

রাজসভায় কীর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, তা আজও বিভিন্ন আশ্রম, মন্দির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহমান। দোলযাত্রা, রাসোৎসব প্রভৃতি উৎসব কৃষ্ণনগরে বিশেষ গুরুত্বে পালিত হয়।

৩. নাট্যচর্চা ও থিয়েটার -

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নাট্যশালার সূচনা হয়েছিল। আজও কৃষ্ণনগরে গিরিশচন্দ্র ঘরানা থেকে শুরু করে আধুনিক থিয়েটার সক্রিয়। নাট্যোৎসব ও স্থানীয় নাট্যদলগুলো কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করছে।

৪. স্থাপত্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্য -

কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত শিব নিবাস ও অন্যান্য মন্দির আজও কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র। এই স্থাপনাগুলো শুধু ভক্তদের জন্য নয়, পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় স্থাপত্যকীর্তিগুলো কৃষ্ণনগরের ইতিহাসকে বহমান রেখেছে।

৫. উৎসব ও সামাজিক জীবন –

দোল, রাসযাত্রা, শিবরাত্রি ইত্যাদি উৎসব কৃষ্ণনগরে আজও রাজপরিবারের ধারার উত্তরসূরি হিসেবে উদযাপিত হয়। এই উৎসবগুলোতে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যচর্চা মিশে গিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জনমানসে স্থায়ী করেছে।

৬. বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন –

আজকের কৃষ্ণনগর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প-সংস্কৃতির ধারা শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানচিত্রেও কৃষ্ণনগরকে তুলে ধরেছে। তবে সমালোচকরা বলেন, রাজাদের শাসনকালে প্রজাদের দুর্দশার সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের একটি বৈপরীত্য ছিল। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁদের অবদান ছাড়া কৃষ্ণনগর আজকের এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী হতো না।

7.3. গবেষণার সারসংক্ষেপ (Summary of the Research) :-

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণনগর রাজাদের, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের, ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান বিশ্লেষণ করা। বাংলার অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাঁকে বিচার করলে দেখা যায়—তিনি ছিলেন বহুমুখী চরিত্রের অধিকারী।

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট –

কৃষ্ণনগর রাজবংশের উত্থান ও বিস্তার বাংলার জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সেই রাজবংশের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসক, যিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলেছেন।

২. সাংস্কৃতিক অবদান -

তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, কীর্তন ও মৃৎশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রজবুলি পদাবলি কীর্তন, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আজও তাঁর উত্তরাধিকার বহন করছে। শিব নিবাসসহ বহু স্থাপত্যকীর্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সাংস্কৃতিক রুচি ও ধর্মীয় অনুরাগের নিদর্শন।

৩. রাজনৈতিক ও বিতর্কিত ভূমিকা -

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিরোধ ও ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত তাঁকে ইতিহাসে বিতর্কিত করে তুলেছে। প্লাসির ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে, যা বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। জমিদারি শোষণ ও প্রজাদের দুর্দশার প্রতিও তাঁর ভূমিকা সমালোচিত।

৪. সামাজিক প্রভাব-

প্রজাদের উপর কঠোর রাজস্ব নীতি, দুর্ভিক্ষকালীন অবহেলা ও জমিদারি শোষণ সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। তবে একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রজাদের সামাজিক জীবনে ঐক্য গড়ে তুলেছিল।

৫. উত্তরাধিকার -

কৃষ্ণনগর রাজাদের উত্তরাধিকার এক দ্বৈত চিত্র বহন করে—শিল্প-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য। ইংরেজ শাসন বিস্তারে সহযোগিতা ও জমিদারি শোষণের সমালোচনা। বর্তমান কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—নাটক, কীর্তন, মৃৎশিল্প ও মন্দির স্থাপত্য—রাজাদের সেই অবদানেরই ধারাবাহিকতা।

৬. সমাপনী মূল্যায়ন -

এই গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, কৃষ্ণনগর রাজাদের বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস এক অম্লমধুর (mixed) উত্তরাধিকার বহন করে। তিনি যেমন বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তেমনি রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ শাসনের বিস্তারেও অবদান রেখেছিলেন। ফলে তাঁকে একদিকে সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক, অন্যদিকে বিতর্কিত রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে ইতিহাসে স্মরণ করতে হয়।

7. তথ্যসূত্র (Bibliography / References) :-

7.1. প্রাথমিক সূত্র (Primary Sources):-

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজাদের ইতিহাস বিশ্লেষণে কেবল মাধ্যমিক গ্রন্থ নয়, সমসাময়িক চিঠিপত্র, দলিল, ভ্রমণকাহিনি ও সরকারি রেকর্ড অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো থেকে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক চিত্র ও ব্যক্তিগত ভূমিকাগুলো স্পষ্ট হয়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সূত্র উল্লেখ করা হলো:

১. ইংরেজ ও কোম্পানির দলিল –

Robert Clive-এর চিঠিপত্র ও ডায়েরি : প্লাসির যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণনগর রাজাদের ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Fort William-India House Correspondence (Vols. I-III) : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডন অফিস ও কলকাতার মধ্যে চিঠিপত্রে কৃষ্ণনগর ও নদিয়ার জমিদারদের উল্লেখ আছে।

Records of the East India Company (British Library, London): রাজনৈতিক সম্পর্ক, আর্থিক যোগান ও জমিদারি প্রথার দলিল।

২. মুঘল ও নবাবি দলিল –

আর্কাইভাল Persian Farmans ও Sanads : নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও অন্যান্য নবাবদের জারি করা ফরমান, যেখানে জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ও রাজস্ব নীতি বোঝা যায়।

মুর্শিদাবাদের নথিপত্র : জমিদারদের আনুগত্য ও বিরোধিতা সম্পর্কিত দলিল।

৩. সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকাহিনি –

Jean Law de Lauriston – Memoire sur quelques affaires de l'Empire Mogol : ফরাসি প্রতিনিধি, যিনি বাংলার জমিদার ও কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন।

Holwell's Accounts (John Zephaniah Holwell) : প্লাসির যুদ্ধ ও নবাবি বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

Travels of Tavernier and Bernier (যদিও খানিকটা আগের সময়, তবে বাংলার জমিদারি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট দেন)।

৪. দেশীয় ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা -

গিরীশচন্দ্র বসু - মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র : আংশিক স্মৃতিকথামূলক বর্ণনা, যেখানে রাজসভা, নাট্যচর্চা ও সমসাময়িক সমাজচিত্র আছে।

স্থানীয় কীর্তনীয় ও কবিদের রচনা : কৃষ্ণচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে রচিত পদাবলি ও প্রশস্তি কবিতা।

৫. সরকারি ও প্রশাসনিক নথি -

Nadia District Gazetteer (British India period): জমিদারি প্রথা, কৃষ্ণনগরের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা।

Bengal Revenue Records (18th century) : রাজস্ব আদায়, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কিত দলিল।

৪.২. গৌণ সূত্র (Secondary Sources) :-

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি গৌণ উৎস অর্থাৎ বই, প্রবন্ধ ও জার্নাল নিবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা গবেষণাকে গভীরতা ও প্রেক্ষাপট দেয়। নিচে কৃষ্ণনগর রাজা, বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে প্রাসঙ্গিক গৌণ সূত্রের একটি তালিকা দেওয়া হলো:

i. বই (Books) :-

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় - বাংলার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতক), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. নীহাররঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

3. সুকুমার সেন – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ), আনন্দ পাবলিশার্স।
4. সত্যেন্দ্রনাথ বসু – নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ, দে'জ পাবলিশিং।
5. অমলেশ ত্রিপাঠী – পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা।
6. গিরীশচন্দ্র বসু – মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদ।
7. P. J. Marshall – Bengal: The British Bridgehead (Eastern India 1740–1828), Cambridge University Press।
8. G. B. Malleson – The Battle of Plassey and the Conquest of Bengal, London।
9. S. C. Hill – Bengal in 1756–1757, London।
10. William Dalrymple – The Anarchy: The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of an Empire, Bloomsbury Publishing।

ii. প্রবন্ধ (Articles)–

1. অমলেন্দু দে – “অষ্টাদশ শতকের বাংলায় জমিদারি শাসনব্যবস্থা ও প্রজাদের অবস্থা”, পরিবেশ ও ইতিহাস জার্নাল।
2. বাণী মুখার্জি – “কৃষ্ণনগর রাজাদের সাংস্কৃতিক অবদান”, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।
3. রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় – “বাংলার নাট্যচর্চায় কৃষ্ণনগরের ভূমিকা”, দেশকালপত্র।

4. Rajat Kanta Ray – “The Zamindars and Politics of Eighteenth Century Bengal”, Indian Economic and Social History Review।
5. C. A. Bayly – “Patrons and Politics in Northern India”, Modern Asian Studies।

iii. জার্নাল (Journals)–

1. Journal of the Asiatic Society of Bengal – বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ।
2. Proceedings of the Indian History Congress – অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ও জমিদারি ব্যবস্থার উপর প্রবন্ধ।
3. Indian Economic and Social History Review – জমিদারি, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা।
4. Modern Asian Studies – ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে জমিদারি ও আঞ্চলিক রাজনীতি।
5. Calcutta Historical Journal – বাংলা ইতিহাস ও কৃষ্ণনগর রাজাদের অবদান সম্পর্কিত প্রবন্ধ।

iv. গাইড :-

কৃষ্ণনগর রাজমহল গাইড সমিতি মজুমদার থেকে আমি অনেক তথ্যসূত্র সংগ্রহ করি |

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

এই গবেষণা প্রবন্ধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমি যাঁদের সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছি তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রথমেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় " Collage mane..... " (UNIVERSITY OF KALYANI) এর শিক্ষক Name..., ..., ... (গাইড - Name) মহাশয় প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর অমূল্য দিকনির্দেশনা, গবেষণার পথে নিরন্তর উৎসাহ ও গঠনমূলক সমালোচনা ছাড়া এই কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কৃষ্ণনগরের স্থানীয় ইতিহাসবিদ, গ্রন্থাগারিক ও গবেষক বন্ধুদের প্রতি, যাঁরা প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। কৃষ্ণনগর রাজপরিবার সম্পর্কিত দলিল ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং নদিয়া জেলা গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার পরিবার ও বন্ধুবর্গের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ তাঁদের অবিরাম সহায়তা, মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণাই আমাকে এই গবেষণা সম্পূর্ণ করার সাহস জুগিয়েছে।

সবশেষে, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার এই গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন। সকলের অবদান আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।